লক্ষ্মীপুর নারায়ণগঞ্জ ফেনীতে

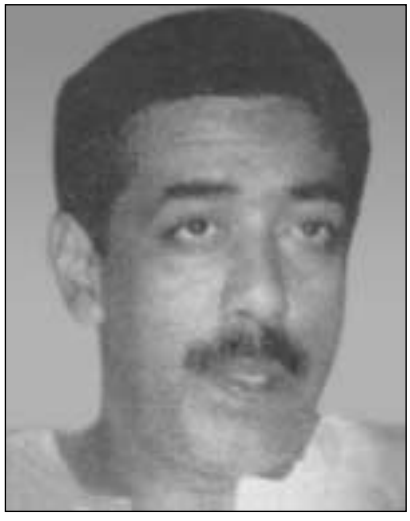

এরা এখন নেই

তবে এ কাদের ছায়া

লিখেছেন **গোলাম মোর্তোজা** ও **টিপু সুলতান**

১৩ অক্টোবর ২০০০ সাল। আজ থেকে প্রায় ১৭ মাস আগের ঘটনা। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদে এসেছিল আওয়ামী লীগের তিন নেতা। ফেনীর জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের আবু তাহের আর নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান। সাপ্তাহিক ২০০০ এদের উপাধি দিয়েছিল 'হাসিনার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' হিসেবে। পাঠকের নিশ্চয় জানা আছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তাকেই বলে, 'যে প্রাণী বা বস্তু স্বীয় স্রষ্টার চরম বিপদ ঘটায়'। এই প্রচ্ছদ কাহিনীতে আমরা স্পষ্টভাবে বলেছিলাম এই ফ্রাঙ্কেস্টাইনের দানবরা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধ্বংস ডেকে আনবে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই সংখ্যাটি নিয়ে সে সময় দেশব্যাপী ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল। আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল আওয়ামী লীগের ভেতরেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলীয় হাইকমান্ড হাজারী, শামীম, তাহের কারো বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো আরো বেশি শেল্টার দিয়েছে। ফলে যা ঘটার ঘটেছেও তাই। এই তিন জেলায় তো আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হয়েছেই। এর প্রভাব পড়েছে সারা দেশেও। প্রমাণ ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচন।

নির্বাচনের আগেই নিজের সাম্রাজ্য ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়েছেন জয়নাল হাজারী। নির্বাচনের রাতে পরাজয় নিশ্চিত

বুঝে পালিয়েছেন শামীম ওসমানও। হাজারী এবং শামীম ওসমান দু'জনেই পালিয়েছেন সীমান্ত অতিক্রম করে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেও দু'জনের মধ্যে মিল ছিল। মিল পাওয়া গেল পালানোর ক্ষেত্রেও।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই লক্ষ্মীপুর ছেড়ে পালিয়েছিলেন তাহের। দেশ ছেড়ে পালানোর আগেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম অপহরণ ও হত্যা মামলার প্রধান আসামি তিনি। মামলার তদন্ত চলছে। তাহের এখন জেলে।

হাসিনার এই তিন ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের কারোরই এলাকায় এখন আর কোনো অবস্থান নেই। ফ্রাঙ্কোনস্টাইনবিহীন ফেনী, লক্ষ্মীপুর আর নারায়ণগঞ্জের মানুষ এখন কেমন আছেন? সন্ত্রাস থেকে কী মুক্তি পেয়েছেন এই জনপদের মানুষ? সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ক্ষমতায় আসা জোট সরকারের কথায় এবং কাজে মিল কতটা? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার জন্য গিয়েছিলাম ফেনী, লক্ষ্মীপুর আর নারায়ণগঞ্জে।

নারায়ণগঞ্জ : মডেল শামীম ওসমান

শামীম ওসমানের জানা থাকতো না এমন কোনো ঘটনা নারায়ণগঞ্জে ঘটতো না। এটা ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতার পাঁচ বছরের চিত্র। নারায়ণগঞ্জের ভালো-খারাপ সব রকমের কাজের সঙ্গেই সম্পৃক্ত থাকতো শামীম ওসমানের নাম। তিনি গড়ে তুলেছিলেন প্রায় পাঁচশ' সদস্যের এক বিশাল সন্ত্রাসী বাহিনী। এই বাহিনীর মাধ্যমে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন সমগ্র নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জে মোট চারটি আসন, চারজন এমপি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের গত পাঁচ বছরের শাসনামলে সেটা কখনো মনে হয়নি। শামীম ওসমান ছাড়া যে নারায়ণগঞ্জে আর কোনো এমপি আছেন সেটা বোঝাও ছিল কষ্টকর। শামীম ওসমান এমপি ছিলেন ফতুল্লা-সিদ্ধিরগঞ্জ আসনের। অথচ তিনি সব সময় অবস্থান করতেন নারায়ণগঞ্জ সদরে।

নারায়ণগঞ্জের সব রকমের উন্নয়ন কাজ শামীম ওসমান নিয়ন্ত্রণ করতেন তার বাহিনীর মাধ্যমে। যে কোনো উন্নয়ন কাজ শুরু হওয়ার আগে ১৫% থেকে ২৫% চলে যেত শামীম ওসমানের পকেটে। শামীম ওসমান নিজেই বলেছেন আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছরে ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ হয়েছে নারায়ণগঞ্জে। এই অর্থের কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা পেয়েছেন শামীম ওসমান। এছাড়াও নারায়ণগঞ্জের বন্দর, গার্মেন্টস সহ সব রকমের ব্যবসায়ীদেরও নিয়মিত চাঁদা দিতে হতো শামীম ওসমানকে। এই অর্থ দিয়ে তিনি পরিচালনা করতেন বিশাল সন্ত্রাসী বাহিনী। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সব রকমের সমর্থন ছিল তার প্রতি। নেত্রীর এমন সমর্থনের কারণেই শামীম ওসমান হয়ে উঠেছিলেন ভয়ঙ্কর প্রতাবশালী। নারায়ণগঞ্জের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের প্রবীণ-নবীন কোনো নেতারই ভূমিকা থাকতো না। আওয়ামী লীগের পরিবর্তে নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'শামীম লীগ'। ত্যাগী নেতা হিসেবে পরিচিত নাজমা রহমানরা কার্যত নিষ্ক্রিয় সময় কাটিয়েছে আওয়ামী লীগের ক্ষমতার পাঁচ বছরে। শামীম লীগের সন্ত্রাসীরা এলাকায় খুন-ধর্ষণ-চাঁদাবাজি-দখল করেছে নির্বিচারে।

কোনো রকমের বিরোধিতা শামীম ওসমান পছন্দ করতেন না। শামীম ওসমানের বিরোধিতা করলে হয় তিনি এলাকা ছাড়া হতেন অথবা খুন হতেন। শামীম ওসমানের অনুমতি ছাড়া প্রশাসন কোনো কাজ করতো না। এমন কী খুনের মামলাও নিত না পুলিশ। বাধ্য হয়েই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছিলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। বিএনপির এমপিরা এলাকায় অবস্থান করতেন শামীম ওসমানের সঙ্গে আপোস করে। শামীম ওসমানের শর্ত ছিল জনসভা বা সংসদে তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। বিএনপির এমপিরা শামীম ওসমানের এই শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। তাই দেখা যায় বিএনপি যতদিন সংসদে ছিল একবারও নারায়ণগঞ্জের কোনো বিএনপি সাংসদ শামীম ওসমানের কর্মকাণ্ড বা সন্ত্রাস বিষয়ে কোনো কথা বলেননি। নিজেদের নেতা-কর্মীদের এলাকায় থাকতে না পারার প্রসঙ্গেও এমপিরা কখনো বলেননি।

'নারায়ণগঞ্জে সন্ত্রাস আছে, চাঁদাবাজিও বন্ধ হয়নি। জনপ্রতিনিধিদের ব্যর্থতার কারণে এটা ঘটছে'

তৈমুর আলম খন্দকার
আহ্বায়ক, নারায়ণগঞ্জ বিএনপি

তখন নারায়ণগঞ্জ নামক রাজত্বের একক নেতা শামীম ওসমান। 'হাসিনার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' প্রতিবেদন তৈরির জন্য এসেছিলাম নারায়ণগঞ্জে। মানুষ শামীম ওসমানের নাম মুখে আনতেও ভয় পেত। স্থানীয় সাংবাদিক থেকে শুরু করে কেউই সেদিন শামীম ওসমান সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। সবার মনে একটাই ভয় যদি 'শামীম লীগ বাহিনী' কোনোভাবে জেনে যায়! শামীম ওসমান নাম শুনলেই মানুষ কেঁপে উঠতো। সেই প্রভাবশালী শামীম ওসমান 'রাজত্ব' ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। পালিয়েছেন রাতের আঁধারে। নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে পালিয়েছে তার বাহিনী প্রধান সারোয়ার, মাকসুদ, আগা মিঠু, নিয়াজুল, টুঙ্গা মাসুদ, টাওয়ার সেলিম, তোফাজ্জল, গোলাম রসুল, নূর হোসেন, নজরুল প্রমুখ সন্ত্রাসীরাও। পালিয়েছে শামীম ওমানের ভাতিজা ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী আজমিরও।

শামীম ওসমানবিহীন জনপদ দেখতে এসে নামলাম চাষাঢ়ায়। প্রিমিয়াম বাসে ঢাকা থেকে আসতে সময় লাগলো ৪৫ মিনিট। এখনকার নারায়ণগঞ্জ আর শামীম লীগের সময়ের নারায়ণগঞ্জের অনেক পার্থক্য। শামীম ওসমান বিষয়ে নারায়ণগঞ্জের প্রায় প্রতিটি মানুষ এখন কথা বলে। গোপনে নয়, প্রকাশ্যে। সবার মধ্যেই যেন প্রাণপণ চেষ্টা, 'শামীম ওসমানের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না।'

শামীম লীগের দাপটে এলাকা ছাড়া বিএনপির নেতা-কর্মীরা এলাকায় ফিরে এসেছেন। ফিরে এসেছেন বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলের সন্ত্রাসীরাও। তারা দখল করে নিয়েছে শামীম বাহিনীর শূন্যস্থান। প্রথম সারির না হলেও নিচের সারির শামীম বাহিনীর সন্ত্রাসীদের অনেকেই বিএনপি পরিচয় ধারণ করেছে। এলাকার সবক'টি স্থান নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা। কয়েকটি গ্রুপ দখল-চাঁদাবাজি করছে পাল্লা দিয়ে। এর মধ্যে দেওভোগ গ্রুপটির নাম আলোচিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এই সন্ত্রাসী গ্রুপটির নেতৃত্বে রয়েছেন জাকির খান। তিনি কবে, কোথায়, কখন পড়াশোনা করেছেন সেটা কেউ জানে না। তার পরিচিতি মূলত সন্ত্রাসী হিসেবে। তারপরও জাকির খানই জেলা ছাত্রদল সভাপতি। তিনি খুবই প্রভাবশালী। চাষাঢ়া মোড়ে এখন শোভা পায় তার বিশাল ছবি। শামীম ওসমানের কারণেই জাকির খান আলোচনায় আসেন। কারণ ক্ষমতার পাঁচ বছরে শামীম ওসমান বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে অধিকাংশ সময় জাকির খানকে জেলে আটক রাখে। ফলে দলে তার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এর আরো আগে অবশ্য জাকির খান ডিআইটি এলাকায় দয়াল মাসুদকে প্রকাশ্যে খুন করে তার আবির্ভাবের ঘোষণা দিয়েছিলেন। জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক বদিউজ্জামান বদু এবং জাকির খান যৌথভাবে নেতৃত্ব দেন দেওভোগ গ্রুপের। এটাই বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ সদরের সবচেয়ে প্রভাবশালী সন্ত্রাসী গ্রুপ। টানবাজার যৌনপল্লীতে জাকির খানদের বেশ কয়েকটি বাড়ি ছিল। এই বাড়িগুলোই ছিল তাদের আয়ের প্রধান উৎস। জাকির খানের বাবা দৌলত খান বহুল

আলোচিত যৌনকর্মী শবমেহের হত্যা মামলার আসামি। মূলত জাকির খানের আয়ের উৎস বন্ধ করার জন্যই শামীম ওসমান টানবাজার যৌনপল্লী উচ্ছেদ করেন।

বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ সদরের ঠিকাদারি এবং চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করছে জাকির খান গ্রুপ। নারায়ণগঞ্জে প্রায় সাড়ে চারশ' গার্মেন্টস রয়েছে। একজন গার্মেন্টস মালিকের সঙ্গে কথা হয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর। তিনি বলেন, 'একটি গার্মেন্টস থেকে প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকার ঝুট, কার্টন বিক্রি হওয়ার কথা। কিন্তু এগুলো বিক্রি হয় ৫ থেকে ৭ হাজার টাকায়। কারণ এগুলোর ক্রেতা সন্ত্রাসীরা। কখনো কখনো টাকা না দিয়েই নিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। আগে এই ঝুট ব্যবসা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো শামীম বাহিনীর সন্ত্রাসীরা। এখন নিয়ন্ত্রণ করছে বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা। একটা নয় তিন-চারটি গ্রুপ। এক গ্রুপ ঝুট নিয়ে গেলে আরেক গ্রুপ এসে চাঁদা নিয়ে যায়।'

জাকির খানের সঙ্গে আমাদের একবার মোবাইলে কথা হয়। তিনি কিছুক্ষণ পর ফোন করবেন বলে জানান। কিন্তু আর ফোন করেননি। দুইদিন পর নারায়ণগঞ্জ থানা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক শাহাদত হোসেন মিলন নামে একজন ফোন করেন। তিনি বলেন জাকির খান এখন ব্যস্ততার কারণে কথা বলতে পারবেন না। তবে পরে কোনো এক সময় কথা বলবেন।

সন্ত্রাসী গ্রুপটির নেতৃত্বে রয়েছেন জাকির খান। তিনি কবে, কোথায়, কখন পড়াশোনা করেছেন সেটা কেউ জানে না

ডেভিড গ্রুপ নারায়ণগঞ্জের আরেক সন্ত্রাসী বাহিনী। গ্রুপ প্রধান ডেভিড নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক। মানুষ খুন থেকে চাঁদাবাজি– সব রকমের অপকর্মের সঙ্গে এই গ্রুপটি জড়িত। ডেভিড বিশ-পঁচিশটি হত্যা মামলার আসামি। শামীম লীগের পাঁচ বছরে ছিল এলাকা ছাড়া। এখন নারায়ণগঞ্জের মিশনপাড়া অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে ডেভিড গ্রুপ। ডন চেম্বার অঞ্চলের সন্ত্রাসী শওকত, হাশেম, শকু, লালু প্রমুখ সন্ত্রাসীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে ডেভিড সন্ত্রাসী কর্মকান্ড শুরু করেছিল বর্তমান বিএনপি আমলে। অস্ত্র এবং চাঁদার ভাগ নিয়ে ডেভিডের সঙ্গে অন্যদের বিরোধ দেখা দেয়। ফলে ডেভিড এখন জুনিয়ার ক্যাডার নিয়ে আলাদা বাহিনী গঠন করেছে। খানপুর হাসপাতালের উল্টো দিকের যুব উন্নয়ন ও জনকল্যাণ ক্লাব দু'টি এখন ডেভিড বাহিনীর টর্চার সেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিরোধিতা করলে, চাঁদা না দিলে ধরে এনে এখানে নির্যাতন করা হয়। শামীম লীগের সময়ে এই ক্লাব দু'টি ছিল সারোয়ারের টর্চার সেল। উল্লেখ্য, সারোয়ার ছিল শামীম ওসমানের প্রধান সন্ত্রাসী কমান্ডারদের এক কমান্ডার। ক্ষমতার পরিবর্তনে সারোয়ারের জায়গায় এসেছে ডেভিড। পরিবর্তন হয়নি টর্চার সেলের। আগে সেখানে নির্যাতন করতো সারোয়ার বাহিনী। এখন নির্যাতন করে ডেভিড বাহিনী। আগেও নির্যাতিত হতো সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, কখনো কখনো বিএনপি নেতা-কর্মী-সন্ত্রাসী। এখনো নির্যাতিত হয় সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-সন্ত্রাসী।

ডেভিড গ্রুপের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাত্রা প্রচন্ডভাবে বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি পুলিশ তার বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ডেভিড পালিয়ে যায়। বর্তমানে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। প্রকাশ্যে আসছে না। তার ০১৮২৪০২০৩ নং মোবাইলে বারবার চেষ্টা করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

হাসান গ্রুপ আধিপত্য বিস্তার করেছে বাবুরাইল, নিতাইগঞ্জ, মাছুয়া বাজার, মন্ডলপাড়া প্রভৃতি এলাকায়। হাসান নারায়ণগঞ্জ মহানগর, বিএনপি'র যুগ্ম আহবায়ক আবদুল মজিদের ভাই।

ইসদাইর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে বিএনপি'র অপু-দিপু-গ্রুপ। আর মাসদাইর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে ওহাব গ্রুপ। ফতুল্লা-সিদ্ধিরগঞ্জ পরিচিত শিল্প এলাকা হিসেবে। সিদ্ধিরগঞ্জে অবস্থিত আদমজী জুট মিল। মিলের নির্বাচিত সিবিএ আওয়ামী লীগের সময় ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থিত। এখন বিএনপির সমর্থিত। সিবিএ ক্যাডাররাও বিএনপি পরিচয়ে সন্ত্রাস করছে। এছাড়া ফতুল্লা-সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে ওহাব গ্রুপ। বিপ্লব গ্রুপের বিপ্লব থানা ছাত্রদলের সভাপতি। ফরিদ-সুমন গ্রুপ সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে শিমরাইল মোড়ের চাঁদাবাজির নেতৃত্ব দেয় সিদ্ধিরগঞ্জ বিএনপি'র সভাপতি কামাল। এমপি গিয়াস উদ্দিনের শেল্টারে সে এই এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। বন্দর এলাকায় চাঁদাবাজি এবং ব্যবসায়ী আধিপত্য বিস্তার করেছে এমপি আবুল কালামের চাচাতো ভাই দুলাল।

তবে গত কিছুদিনে পুলিশের তৎপরতায় বেশকিছু বিএনপি সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছে। ওহাব গ্রুপ প্রধান ওহাব, ডেভিডের ভাই জুয়েলসহ প্রায় ২৮ জন সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু তারপরও গ্রুপগুলোর সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ হয়নি।

বিএনপি'র এই প্রতিটি গ্রুপই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বিএনপি'র দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধের মাঝে পড়ে ইতিমধ্যে একজন স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে।

সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বাইরে নারায়ণগঞ্জে বিএনপি'র কোনো কর্মকান্ড নেই বললেই চলে। সদরের এমপি আবুল কালাম একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, নিয়ন্ত্রণও নেই। তার এলাকায় সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি চলছে অথচ তিনি কিছুই করতে পারছেন না। ভালো মানুষ সেজে চুপচাপ বসে আছেন। তার ওপর এলাকার মানুষের ক্ষোভ দিন দিন বাড়ছে। নারায়ণগঞ্জের বিএনপি'র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বর্তমান বস্ত্রমন্ত্রী মতিন চৌধুরীর একটা বড় ভূমিকা থাকে। বিএনপি'র একজন নেতার মতে, মতিন চৌধুরী যতদিন আছেন ততদিন নারায়ণগঞ্জের রাজনীতি ভালো হবে না।' কারণ অতীতেও মতিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সন্ত্রাসীদের শেল্টার দেয়ার। অভিযোগ আছে এখনো। জানা যায়, নারায়ণগঞ্জের প্রধান সন্ত্রাসী জাকির খানের ক্ষমতার অন্যতম উৎস মতিন চৌধুরী । কিছুদিন আগে পুলিশ জাকির খানকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ আছে রাতেই মতিন চৌধুরী থানা থেকে জাকির খানকে ছাড়িয়ে নেন। শামীম ওসমান যেভাবে তার সন্ত্রাসীদের শেল্টার দিতেন মতিন চৌধুরীও ঠিক একইভাবে শেল্টার দিচ্ছেন তার সন্ত্রাসীদের। আগে নারায়ণগঞ্জের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন শামীম ওসমান। এখন নিয়ন্ত্রণ করেন মতিন চৌধুরী। মূলত কেন্দ্রীয় নেতাদের শেল্টারের কারণেই নারায়ণগঞ্জে সন্ত্রাস বাড়ছে। অনেক কেন্দ্রীয় নেতা আবার শামীম ওসমানের বৈধ-অবৈধ ব্যবসার মালিকানা নেয়ারও চেষ্টা করছেন।

শামীম লীগ আমলে শামীম ওসমান নিটল মোটরস থেকে ৯৫টি মিনিবাস কিস্তিতে নিয়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ছাড়েন। তার পরিবহনের নাম দেয়া হয়েছিল শীতল পরিবহন। এর মধ্যে এসি ও নন এসি দু' ধরনেরই মিনি বাস ছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের পুরো সময় শামীম ওসমান এসব বাস চালিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করলেও তিনি নিটল মোটরসকে কোনো টাকা দেননি। ক্ষমতার পরিবর্তনের পর নিটল মোটরস তাদের নিজস্ব বাহিনী দিয়ে রাস্তা থেকে শীতল পরিবহনের সব বাস আটক করে নিটলের টঙ্গীস্থ ওয়ার্কশপে নিয়ে যায়। এসব বাসকে নতুন করে মেরামত ও রঙ করা হয়েছে। শীতল পরিবহন নাম

পাল্টিয়ে ঢাকা বাস কোম্পানি নাম দিয়ে বাসগুলো আবার রাস্তায় নামানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর ছত্রছায়ায় ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতির কার্যকরী সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ আবদুল বাতেনসহ ১০ জনের একটি সিন্ডিকেট 'ঢাকা বাস কোম্পানি' নামে শামীম ওসমানের বাসগুলো রাস্তায় চালাতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ২০টি বাস চলতে শুরু করেছে। বাকি বাসগুলো পর্যায়ক্রমে শীঘ্রই রাস্তায় নামছে বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি সায়েদাবাদে পরিবহন নেতা আবু নাসের তোহা হত্যার সঙ্গে সাইফুল ইসলামের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। সাইফুল নিজেকে মির্জা আব্বাসের লোক বলে দাবি করে।

দীর্ঘদিন ধরে নারায়ণগঞ্জ বিএনপি চলছে আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে। নারায়ণগঞ্জ বিএনপি'র আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার। সব সময়ই শামীম ওসমানের টার্গেট ছিলেন তিনি। বিএনপি'র জনসভায় বক্তৃতা করার সময় তিনি শামীম ওসমান বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গত নির্বাচনে মনোনয়ন চেয়ে পাননি। বর্তমান তিনি বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান।

আহ্বায়ক তৈমুর আলম খন্দকারের সঙ্গে বিএনপির সদরের এমপি আবুল কালাম, নারায়ণগঞ্জ-১-এর এমপি মতিন চৌধুরী, নারায়ণগঞ্জ-৪-এর এমপি গিয়াসউদ্দিনসহ কারো সম্পর্কই ভালো না। মূলত নেতাদের মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণেই নারায়ণগঞ্জে বিএনপি'র সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। দলীয় সন্ত্রাসীদের ওপর নেতাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সন্ত্রাসীদের সবার সামনেই মডেল শামীম ওসমান। সবাই নিজেকে শামীম ওসমান ভাবছে।

নারায়ণগঞ্জ বিএনপি'র আহ্বায়ক তৈমুর আলম খন্দকারের সঙ্গে কথা হয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর। আপনাদের সরকারের সময়ে তো নারায়ণগঞ্জে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি চলছে। জেলা আহ্বায়ক হিসেবে আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

'নারায়ণগঞ্জে সন্ত্রাস আছে, চাঁদাবাজিও বন্ধ হয়নি। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। জনপ্রতিনিধিদের ব্যর্থতার কারণে এটা ঘটছে।'

আহবায়ক হিসেবে আপনার ওপর তো দায়দায়িত্ব পড়ে।

'আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। কিন্তু এখানে দলীয় এমপিদের তো একটা ভূমিকা থাকতে হবে। তাদের সঙ্গে দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের কোনো সম্পর্ক নেই। শামীম ওসমান বাহিনীর গুলির সামনে নারায়ণগঞ্জে বিএনপি'র রাজনীতি করেছি। দল ধরে রেখেছি। যে নেতা কর্মীরা শামীম ওসমানের নির্যাতন সহ্য করেছে আজ আমাদের

তাহেরের রাজপ্রাসাদ ভেঙে দেয়া হয়েছে

এমপিদের কাছে তাদের কোনো দাম নেই।

আমরা কোনো জনসভায় ডাকলে এমপিরা প্রটোকলের কথা চিন্তা করে আসেন না। একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের এমপিরা ফুল দিয়েছেন ডিসি-এসপিদের সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু আমি ফুল দিয়েছি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে।'

নারায়ণগঞ্জের সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি বন্ধের উপায় কী?

'২ অক্টোবরের পর থেকে যারা বিএনপি নারায়ণগঞ্জে এখন দাপট তাদের। জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদেরই ওঠাবসা। ২ অক্টোবরের বিএনপিকে বাদ দিয়ে তারা যদি ত্যাগী নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করেন তাহলে নারায়ণগঞ্জের পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব।'

১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকেই নারায়ণগঞ্জের সুবিধাবাদী একটি অংশ হঠাৎ করে বিএনপি হয়ে গেছে। এরাই এখন পরিচিত ২ তারিখের বিএনপি হিসেবে। যেমন শামীম ওসমানের বড় ভাই নাসিম ওসমানের খুবই কাছের ক্যাডার ছিল ইশমত। নারায়ণগঞ্জে খুন, দখল, চাঁদাবাজিসহ সব রকমের অপকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল ইশমত। বিএনপি'র বহু নেতা-কর্মী তার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। সেই ইশমত এখন নারায়ণগঞ্জ বিএনপি'র বড় নেতা। শকু, লাবলু আগে তাদের দলের কোনো কর্মসূচিতে দেখা যেত না। বড় নেতা এখন তারাও।

বিএনপি'র ঋণ খেলাপি ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলীর ভাগ্নে ফরিদ। ২ অক্টোবর সকালে একটি পুরনো মডেলের গাড়ি নিয়ে নারায়ণগঞ্জে আসে। ৩ অক্টোবর ঢাকায় ফিরে যায় ৪২ লাখ টাকা দামের গাড়ি নিয়ে। ২ অক্টোবরের নব্য বিএনপি'র দাপটে আসল বিএনপি এখন নারায়ণগঞ্জ থেকে হারানোর পথে।

লক্ষ্মীপুর : তাহেরের প্রতিচ্ছায়া

জেলা শহর লক্ষ্মীপুরকে সারা দেশের মানুষের কাছে পরিচিত করার ক্ষেত্রে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তার নাম আবু তাহের। তিনি ছিলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত লক্ষ্মীপুর পৌরসভা চেয়ারম্যান। কোনো রকম প্রতিদ্বন্দ্বী পছন্দ করতেন না। চেয়ারম্যান নির্বাচনে তার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাকে তিনি এলাকা ছাড়া করেছিলেন রাইফেলের মুখে। আওয়ামী লীগের ক্ষমতার পাঁচ বছরে তাহের ছিল আকাশ সমান ক্ষমতার মালিক। তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। হাজারী, শামীম ওসমানের মতো তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক বিশাল বাহিনী। যে বাহিনীর নেতৃত্ব দিত তাহেরের ছেলে বিপ্লব। মানুষ খুন এবং ধর্ষণে বিপ্লবের কোনো জুড়ি ছিল না। ধর্ষণের প্রতি আকর্ষণ ছিল তাহেরেরও। একের পর এক সবচেয়ে জঘন্যতম অপকর্ম করার পরও আওয়ামী লীগের হাই কমান্ডের সমর্থন সবসময়ই ছিল তার পক্ষে। রাষ্ট্রীয় শেল্টার তাকে করে তুলেছিল অপ্রতিরোধ্য। তাহেরের বিরোধিতা করে লক্ষ্মীপুরে কারো পক্ষে থাকা সম্ভব ছিল না। বিএনপি'র কোনো নেতা-কর্মী-সন্ত্রাসী তো এলাকায় থাকতে পারতোই না, এলাকায় থাকতে পারতো না অনেক আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাও। লক্ষ্মীপুরের মানুষের কাছে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের নাম হয়ে উঠেছিল তাহের। বিএনপি বা তার প্রতিদ্বন্দ্বী কারো নামে কেস দেয়ার জন্য অনেক সময় সে নিজের দলের নেতা কর্মীদেরও খুন করতো। নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামী লীগের একজন নেতা ২০০০কে বলেন, 'তৎকালীন বিএনপি সাংসদ খায়রুল এনাম তাহেরের ভয়ে এলাকায় খুব কম আসতেন। খায়রুল এনামকে বিপদে ফেলার জন্য একদিন রাতে তাহের বাহিনী আমাকে আক্রমণ করে। তাহেরের ছেলে বিপ্লবের নেতৃত্বে আমার ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়। আমি আওয়ামী লীগ করি তারপরও তাহেরের বাহিনী কেন আমাকে হত্যা করতে চায়? পরে জানতে পারি খায়রুল এনামের নামে কেস দেয়ার জন্য তাহের আমাকে হত্যার নির্দেশ

দিয়েছিল। আমি কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে ঢাকায় চলে আসি। তাহের গ্রেপ্তারের পর এলাকায় ফিরে এসেছি'।

লক্ষ্মীপুরের প্রায় সব বিএনপি নেতারা এলাকা ছাড়লেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন একজন। তার নাম অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম। নেতাহীন বিএনপির রাজনীতিকে লক্ষ্মীপুরে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। বিএনপি নেতা-কর্মীদের নামে দায়ের করা প্রায় সবগুলো মামলাই তিনি পরিচালনা করতেন। ছোট আকারে হলেও বিএনপি'র রাজনৈতিক কর্মকান্ডও তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আচরণ একদমই পছন্দ ছিল না তাহেরের। অনেকবার অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলামকে হুমকিও দিয়েছেন তাহের। কিন্তু নূরুল ইসলাম তার কর্মকান্ড বন্ধ করেনি। অবশেষে নূরুল ইসলামের পরিণতি যা হওয়ার তাই হয়েছে। ২০০০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তাহের বাহিনী রাতের আঁধারে তাকে অপহরণ করে হত্যা করেছে। এই অপহরণ ও হত্যার নেতৃত্ব দিয়েছে তাহেরের ছেলে বিপ্লব। অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলামকে হত্যার পরেই তাহের সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসে। তাহেরের পক্ষে সমর্থন অব্যাহত রাখার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাককে পাঠানো হয় লক্ষ্মীপুরে। আব্দুর রাজ্জাকের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য জনসভায় তাহের ঘোষণা দেয়, 'আমার বিরুদ্ধে লিখলে সাংবাদিকদের হাত-পা কেটে মেঘনায় ভাসিয়ে দেয়া হবে।' অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলামের লাশও তাহের মেঘনায়ই ভাসিয়ে দিয়েছিল।

তাহের বাহিনীর হাতে অপহরণ ও নিহত অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম

লক্ষ্মীপুরে তাহের নেই। তাহেরের ঠিকানা এখন কুমিল্লা কারাগার। এলাকায় নেই তাহের বাহিনীও। তাহেরের প্রধান কমান্ডার ছেলে বিপ্লবও পলাতক। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তাহের তার স্রষ্টা হাসিনার পতন ঘটিয়েছে, নিয়মানুযায়ী। পতিত হয়েছে সে নিজেও। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনবিহীন লক্ষ্মীপুরের চিত্র কেমন হয়েছে? কেমন আছেন লক্ষ্মীপুরবাসী? লক্ষ্মীপুরের রাজনৈতিক অবস্থা এখন কেমন?

ফেনী থেকে লক্ষ্মীপুর পৌঁছাতে সময় লাগলো প্রায় দেড় ঘন্টা। ফেনীর সাংবাদিক টিপু সুলতানসহ আমরা যখন লক্ষ্মীপুরে এসে পৌঁছলাম তখন বারোটার মতো বাজে। আকাশে মেঘ। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। 'হাসিনার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' প্রতিবেদন তৈরির জন্য যেদিন লক্ষ্মীপুরে এসেছিলাম সেদিনও আকাশে মেঘ ছিল, ছিল বৃষ্টিও। আবহাওয়ার চমৎকার সাদৃশ্য। কয়েকটি হোটেল খুঁজে অবশেষে এসে উঠলাম হোটেল 'আবে হায়াত'-এ। হোটেলে উঠে বুঝলাম পূর্বেও উঠেছিলাম এই হোটেলেই। কাকতালীয়-ভাবে সবকিছুই মিলে গেল পূর্বের সঙ্গে। রসিকতা করে বললাম রাজনীতির চিত্রও কী তাহলে মিলে যাবে!

লক্ষ্মীপুরের রাজনীতির বর্তমান অবস্থাটা জানার আগে পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে আর একটু পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাহের আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে কখনো রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতো না। রাজনৈতিক কর্মকান্ড বলতে তার কিছু ছিলও না। তাহেরের ছিল ৩১টি বাহিনী। এর মধ্যে ১৪টি বাহিনী রিমোট অঞ্চলে কাজ করতো। তাহের নিজে তার বাড়ি থেকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে এসব বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতো। তাহেরের প্রধান বাহিনীগুলোর মধ্যে মতিন বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতো হাজী পাড়া, চৌধুরী পল্লী, উত্তর জয়পুর, দত্তপাড়া, রসিদপুর। জাহাঙ্গীর বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতো চন্দ্রগঞ্জ, পাঁচ পাড়া, পাল পাড়া ইত্যাদি অঞ্চল। দুলাল বাহিনীর দখলে ছিল উত্তর হামছদি, দক্ষিণ হামছদি, দালাল বাজার, গোপিনাথ পুর, পালের হাট, বিজয় নগর, কালি বাজার, কাদের দিঘির পাড়, মিরগঞ্জ। লিটন বাহিনী, শামীম বাহিনী, বাবুল বাহিনী, আলমগীর বাহিনী, ভুলু বাহিনী, ব্যাং কামাল বাহিনী, গুল কামাল বাহিনী, আলাউদ্দিন বাহিনী, লিটন, হাজারী বাহিনী– এসব বাহিনীগুলোর মাধ্যমে সমগ্র লক্ষ্মীপুরে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল তাহের। তবে তাহেরের প্রধান বাহিনী ছিল তার ছেলের নেতৃত্বে বিপ্লব বাহিনী।

তাহের বাহিনীর রাজত্বের সময়েই গড়ে উঠেছিল আরেক বাহিনী। সেটার নাম টাইগার ফারুক বাহিনী। এই বাহিনী ছিল বিএনপি'র। এই টাইগার ফারুক বাহিনীর হাতেই নিহত হয়েছিল তাহেরের ভুলু বাহিনীর প্রধান ভুলু এবং ব্যাং কামাল।

তাহেরের অবর্তমানে দৃশ্যত লক্ষ্মীপুরের রাজনীতি এখন অনেকটা শান্ত। আগে মানুষের মাঝে যে আতঙ্ক ছিল সেটা এখন নেই। বিএনপি'র তরুণ সাংসদ সাবেক ছাত্রদল সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন এলাকায় সুস্থ রাজনীতির ধারা ফিরিয়ে আনতে। বিএনপি'র সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত এমন প্রায় ২০ জন সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছে বর্তমান বিএনপি আমলে। এরমধ্যে রয়েছে হাকিম বাহিনীর বড় হাকিম, ছোট হাকিম, লিটন বাহিনীর লিটন, বেলাল বাহিনীর বেলাল, এরা সবাই ছাত্রদল সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত ছিল। বিএনপি সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১১৯টির মতো অস্ত্র। এরমধ্যে আধুনিক জি-৩ রাইফেলও রয়েছে। অস্ত্রগুলো উদ্ধার করেছে প্রশাসন বা পুলিশ নয়। অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে পুলিশের কাছে জমা দিয়েছে লক্ষ্মীপুরের দুই এমপি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এবং খালেদা জিয়ার আসন থেকে নির্বাচিত আবুল খায়ের ভূঁঞা।

প্রশাসনের তালিকা অনুযায়ী লক্ষ্মীপুরে এখন চিহ্নিত সন্ত্রাসীর সংখ্যা ২১৯ জন। এরমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গ্রেপ্তার হয়েছিল ১৯ জন। অন্যরা এখন পলাতক। তারপরও লক্ষ্মীপুরের মানুষের মনে এখন একটা অজানা ভয় ভর করে আছে। কয়েকজন সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হলেও তাহের বাহিনী বিপুল অস্ত্র ভান্ডারের কোনো অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি। এমপি এ্যানি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলেও সুস্থ ধারায় লক্ষ্মীপুরের বিএনপি ফিরিয়ে আনতে পারছেন না পুরোপুরিভাবে। লক্ষ্মীপুরে বিএনপির রাজনীতি নেই বললেই চলে। ক্ষমতা এবং অর্থ আয়ের যে পথ তাহের দেখিয়ে গেছে সবাই সেদিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ছে। বিএনপি'র রাজনীতির চেয়ে উন্নয়ন কাজের ঠিকাদারী বা কমিশন পাওয়াটা তাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ। পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, গণপূর্ত বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলসহ প্রভৃতি বিভাগে বিএনপি সরকারের প্রথম তিন মাসে প্রায় তিন কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ হয়েছে। অভিযোগ আছে এই কাজগুলো কে পাবে, কীভাবে পাবে, কার কমিশন কত হবে– সব

'টাইগার ফারুক, দিপু, এনায়েত এদেরকে আমরা সন্ত্রাসী বলি না'

সাহাবুদ্দিন সাবু

সদস্য সচিব, লক্ষ্মীপুর বিএনপি

কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছেন লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপি'র সদস্য সচিব সাহাবুদ্দিন সাবু। তিন কোটি টাকার মধ্যে অভিযোগ আছে তিনি একাই করেছেন দুই কোটি টাকার কাজ। বিএনপির অনেক নেতা-কর্মী ২০০০কে বলেন, 'তাহেরের পথেই এগিয়ে চলেছে সাবু। আসলে তাহেরের সঙ্গে তো সাবুর সব সময়ই যোগাযোগ ছিল।'

সাবুর লোকজন ট্রাক স্ট্যান্ড, বাস স্ট্যান্ড, টেম্পু স্ট্যান্ড, মাছ ঘাট সব কিছুই ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছে। লক্ষ্মীপুরে রয়েছে ৯৬ কি.মি. মেঘনা নদী পথ। এর ৪৮টি পয়েন্টে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা চাঁদাবাজি হয়। এছাড়া এই অঞ্চলের মাছঘাটগুলো থেকে প্রতিদিন চাঁদা আদায় করা হয় ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা। অথচ কাউকেই এর ইজারা দেয়া হয়নি। বিগত খালেদা জিয়া সরকারের সময়ে এসব ইজারা বাতিল করা হয়। কিন্তু মাছ ব্যবসায়ীরা রক্ষা পাচ্ছেন না চাঁদার হাত থেকে। এক সময় এই অঞ্চল থেকে চাঁদা আদায় করতো তাহের বাহিনী। এখন চাঁদা নেয় বিএনপি বাহিনী বা সাবু বাহিনী।

বর্তমান বিএনপি'র প্রধান সন্ত্রাসী বাহিনীগুলোর মধ্যে রয়েছে রকেট লাঞ্চার ফারুক বাহিনী। সে রকেট লাঞ্চারসহ একবার গ্রেপ্তার হয়েছিল। শহরের লামছড়ি, শমসের বাদ প্রভৃতি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে তারা। এছাড়া ফয়েজ বাহিনীও এই এলাকায় সক্রিয় রয়েছে।

সোহেল বাহিনী দখল প্রতিষ্ঠা করেছে দালান বাজার, নন্দনপুর, হামছাদি, চর রহিতা, পালের হাট, কালি বাজার, মিরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল। সোহেল বাহিনী প্রধান সোহেল জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। এছাড়াও তার আর একটি পরিচয় তিনি সাহাবুদ্দিন সাবুর ভাগিনা।

আহত বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে খিল বাইনা, পার্বতীনগর, সোনাপুর, রশিদপুর, প্রভৃতি অঞ্চল। অহিত বাহিনী প্রধান অহিত একবার ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিল। সে যুবদলের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত। তাহেরের সময়ে সে বিদেশে চলে গিয়েছিল।

ছাত্রদল ক্যাডার আনোয়ার বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে দত্তপাড়া, হাজত পাড়া, চৌধুরী পল্লী, উত্তর জয়পুর, বটতলি প্রভৃতি অঞ্চল। যুবদল ক্যাডার কামরুল বাহিনীর আধিপত্য চন্দ্রগঞ্জ, পাঁচপাড়া, দত্তপাড়া, কামার হাট, আন্ডার ঘর, হাদার ঘর প্রভৃতি এলাকায়। কিছুদিন আগে কামরুল বাহিনীর দুই ক্যাডারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কামরুল তার বাহিনী নিয়ে চন্দ্রগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে। এবং বাহিনীসহ কামরুল গ্রেপ্তার হয়।

হুমায়ুন বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে উত্তর মধুপুর, দক্ষিণ মধুপুর, লোহার কান্দি প্রভৃতি অঞ্চল। হুমায়ুন বাহিনীর প্রধান হুমায়ুন থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক। বিএনপি'র সময়েই গ্রেপ্তার হয়েছিল। এখন জামিনে আছে।

জানা যায় এই সব ক'টি বাহিনীর প্রধান শেল্টারদাতা সাহাবুদ্দিন সাবু। সাবুর সহকারী হিসেবে রয়েছেন জেলা যুবদল সেক্রেটারি মাইনুদ্দিন চৌধুরী বিরাজ।

এই বাহিনীগুলোর মাধ্যমেই লক্ষ্মীপুরে চলছে নীরব সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজি। এ কারণে দলীয় হাই কমান্ডে সাহাবদ্দিন সাবুকে গ্রেপ্তার করার বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। সাবুর কানেও আসে বিষয়টি। এ সময় এলাকায় আসে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। তার সঙ্গে ঢাকায় চলে আসে সাবু। সব কিছু ম্যানেজ করে আবার ফিরে যায় এলাকায়।

'যে কোনো উপায়ে আমরা লক্ষ্মীপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনবো'

শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এমপি

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি'র প্রধান সন্ত্রাসী বাহিনী টাইগার ফারুক বাহিনীর ফারুক এবং দিপু বাহিনীর দিপু এখন জেলে। দিপুর নামে হত্যাসহ মামলার সংখ্যা ২৭টি। জানা যায় ইতিমধ্যে তিনি ২৫টি মামলা থেকে জামিন পেয়েছেন।

'৯৬ সালের শেষ দিকে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র সন্ত্রাসীদের মাঝে বন্দুক যুদ্ধে হেদায়েত উল্লাহ খলিফা নামে একজন নিহত হয়। আওয়ামী লীগ তাকে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করে। এর প্রতিশোধ নিতে তাহের বাহিনী এক যুবদল নেতার মায়ের হাত কেটে ফেলে। স্ত্রীকে বিবস্ত্র করে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর তাহের বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে দিপু বাহিনী। নৌবাহিনীর অফিসার ফজলুল করিমের দুই ছেলে ছিল তাহের বাহিনীর ক্যাডার। দিপু বাহিনী তাদের আক্রমণ করে। ছেলেরা বাড়িতে ছিলেন না। ফজলুল করিম ছুটিতে সেই সময় বাড়িতে ছিলেন। দিপু বাহিনীর গুলিতে আহত হয়ে ফজলুল করিম পানিতে ঝাঁপ দেয়। দিপু বাহিনী পানির ভেতরেই তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। দিপুর ২৭ মামলার মধ্যে এই মামলাটিও রয়েছে।

টাইগার বাহিনী প্রধান ফারুকের নামে মামলার সংখ্যা ২৯টি। তিনি ১৮ মামলায় জামিন পেয়েছেন। অন্যগুলো জামিনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

বিএনপি'র এই কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের বের করে আনার জন্য সব রকমের তদবির করছেন সদস্য সচিব সাহাবুদ্দিন সাবু এবং আহ্বায়ক সৈয়দ শামসুল আলম। সম্প্রতি পৌরসভার একটি টেন্ডার ছিনতাইয়ের ঘটনার সঙ্গে সাবুর নাম এসেছে। এমপি এ্যানির ত্বরিত সিদ্ধান্তে ছিনতাইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় জনকে দল থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে। কিন্তু সাবুর দাপট এতে কমেনি। এই নানাবিধ অভিযোগের বিষয় নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে কথা হয় সাহাবুদ্দিন সাবুর।

তাহের লক্ষ্মীপুরে নেই, নেই তাহের বাহিনীও। কিন্তু লক্ষ্মীপুরে এখনো সন্ত্রাস আছে, আছে চাঁদাবাজি। এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে আপনাদের।

'কিছু কিছু ঘটনা আমাদের ছেলেরা ঘটিয়েছে। আসলে যারা পাওয়ারফুল থাকে তাদের দাপট একটু বেশি থাকে।'

পৌরসভার টেন্ডার ছিনতাইয়ের ঘটনার সঙ্গে আপনার নাম আলোচিত হয়েছে।

'পৌরসভার টেন্ডার ছিনতাইয়ের সময় আমি ঢাকায় ছিলাম। এর সঙ্গে জড়িত নয়জনকে আমরা দল থেকে বহিষ্কার করেছি।'

অভিযোগ আছে আপনি সন্ত্রাসীদের শেল্টার দিচ্ছেন।

'দায়িত্বে থাকলে অনেকেই অনেক অভিযোগ করে। আমি কোনো সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেই না।'

টাইগার ফারুক, দিপু এদের সঙ্গে আপনার ভালো সম্পর্কের কথা জানা যায়।

'টাইগার ফারুক, দিপু এদের নামে তাহের অনেক মামলা দিয়েছে। এগুলো মিথ্যা মামলা। আমরা তাদের জেল থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছি।'

টাইগার ফারুক এবং দিপু তো পরিচিত দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে। অনেকগুলো হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তারা।

'টাইগার ফারুক, দিপু, এনায়েত এদেরকে আমরা সন্ত্রাসী বলি না। তাহেরের কারণে এরা এলাকা ছাড়া হয়েছিল। এলাকায় ফিরে যাওয়ার জন্যেই তারা 'বাহিনী' গঠন করেছিল।'

যে কোনো কারণেই হোক এরা তো সন্ত্রাসী কর্মকান্ডই করেছে। মানুষ খুন করেছে।

'না। এদের কাজকে আমরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মনে করি না। মানুষ তো ক্রস ফায়ারেও খুন হতে পারে।'

আনোয়ার বাহিনী এবং বাবুল বাহিনীর সঙ্গেও আপনার যোগাযোগ আছে বলে জানা যায়।

'আসলে আনোয়ার বাহিনী নয়,

আনোয়ার সমর্থক অনেক লোক আছে। বাবুল বাহিনী নয়, বাবুলেরও সমর্থক অনেক লোক আছে।'

নিজেরা সন্ত্রাসীদের শেল্টার দিয়ে কী লক্ষ্মীপুর থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হবে?

'তাহের বাহিনীর কোনো অস্ত্র উদ্ধার হয়নি। তাহেরের অস্ত্র এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে না পারলে লক্ষ্মীপুর থেকে সন্ত্রাস দূর হবে না।'

আপনি গ্রেপ্তার হতে পারেন এমন একটি কথা শোনা গিয়েছিল।

'জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মিটিং-এ সন্ত্রাস নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। জেলা প্রশাসক এবং এসপিকে সন্ত্রাস দূর করতে না পারার জন্য দায়ী করা হয়। এ কারণে তারা ক্ষুব্ধ ছিল। তাই হয়ত আমাকে গ্রেপ্তারের কথা আলোচিত হয়েছিল। আসলে এরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

লক্ষ্মীপুরের বিএনপি'র প্রধান সন্ত্রাসীরা হয়তো অল্প সময়ের মধ্যেই জেল থেকে বেরিয়ে আসবে। অনেকে বাইরে রয়েছেও। সাহাবুদ্দিন সাবুর কথা থেকেও সন্ত্রাসীদের বিষয়ে তাদের মনোভাব বোঝা যায়। লক্ষ্মীপুরের আগামী সময়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন হবে এখনই বা কেমন আছে? এ প্রসঙ্গে লক্ষ্মীপুর সদরের এমপি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, 'আপনি লক্ষ্মীপুর থেকে ঘুরে এসেছেন, সেখানকার আইনশৃঙ্খলা এখন কেমন সেটা আমার চেয়ে আপনার ভালো জানার কথা। তবে আমি বলতে পারি অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে লক্ষ্মীপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন ভালো।'

কিন্তু সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজির ঘটনা তো এখনো ঘটছে।

'যে কোনো স্থানে যে কোনো ঘটনা ঘটার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। সম্প্রতি একটি টেন্ডার ছিনতাইয়ের ঘটনায় আমরা ৯জনকে বহিষ্কার করেছি।'

বিএনপির সদস্য সচিবসহ কারো কারো বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের শেল্টার দেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

'আমার জানা মতে বিএনপি'র কোনো নেতা সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে না। তবে আমরা সব বিষয়ে খুবই সতর্ক আছি। যে কোনো উপায়ে আমরা লক্ষ্মীপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনবো। আমি জনসভায়ও বলেছি সন্ত্রাসীদের কোনোভাবে আশ্রয় দেয়া হবে না। সন্ত্রাসী যেই হোক আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের দলের সন্ত্রসীদের ধরিয়ে দিয়েছি।'

লক্ষ্মীপুরের সাধারণ মানুষ, নেতা-কর্মী, ব্যবসায়ী সবাই মনে করে এমপি এ্যানি আন্তরিকভাবেই চাইছেন লক্ষ্মীপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু দলের সদস্য সচিব সাবু যদি টাইগার ফারুকদের সন্ত্রাসী মনে না করেন তাহলে শান্তি কীভাবে প্রতিষ্ঠা হবে সেই প্রশ্নও সবার মনেই আছে।

লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসক এসএম জহুরুল ইসলামের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে। তখন তিনি বলেছিলেন, লক্ষ্মীপুর ১ মার্চ থেকে শান্তির জনপদে পরিণত হবে। আজ মার্চ মাসের ৬ তারিখ। লক্ষ্মীপুরের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

লক্ষ্মীপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন কেমন? এই প্রশ্নের উত্তরে জেলা প্রশাসক এস এম জহুরুল ইসলাম ২০০০ কে বলেন, 'পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। আগে মানুষ কথা বলতে ভয় পেত, সন্ধ্যার পর রাস্তায় হাঁটতে ভয় পেত। এখন রাত বারোটা, একটা পর্যন্ত মানুষ রাস্তায় থাকে।'

এখনও তো সন্ত্রাস চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটছে।

'এই অঞ্চলটি অনেকদিন ধরেই একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিছু গ্যাং লিডার ছিল। তারা কেউ কেউ ধরা পড়েছে।'

'এই অঞ্চলটি অনেকদিন ধরেই একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল'

এসএম জহুরুল ইসলাম

ডিসি, লক্ষ্মীপুর

সন্ত্রাসীদের বড় অংশটি এখনো বাইরে।

'বড় অংশ নয়। আমি বলব ছোট অংশটি এখন বাইরে রয়েছে। বড় গ্যাং লিডার তাহেরসহ অনেকেই এখন হাজতে। এখন বাইরে আছে ব্লাক আনোয়ার বাহিনী এবং মতিন বাহিনী। এ দুটোই এখন প্রধান গ্যাং, যারা অপরাধ করছে। মতিন সম্ভবত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। ব্লাক আনোয়ার মাঝে মাঝে এসে ছোটখাটো সমস্যা তৈরি করছে। আমরা চেষ্টা করছি তাদের গ্রেপ্তারের জন্যে।'

গ্রেপ্তার করতে না পারার কারণ কী?

'সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এলাকার মানুষ এখনো মনে করে সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে দিলে নিরাপত্তার সমস্যায় পড়তে হবে। পুরনো ভয় মানুষ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারছে না।'

লক্ষ্মীপুর শহরে তাহেরের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়েই দেখলাম এক সময়ের রাজপ্রাসাদের সামনের অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। পেছনের অংশটি এখনো অক্ষত। তাহেরের পরিবারের সদস্যরাই থাকছেন। এ প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক বললেন, 'কোর্টের রায়ের ভিত্তিতেই আমরা তাহেরের বাড়ির একটি অংশ ভেঙেছি। অন্য অংশটি নিয়ে মামলা চলছে। কোর্টের রায় পেলে আমরা অন্য অংশটিও ভেঙে দেব।'

অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম হত্যা মামলার সর্বশেষ অবস্থা কী?

'মামলার তদন্ত প্রায় শেষের পথে। তদন্তে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। অপহরণ এবং হত্যার সুনির্দিষ্ট আলামত পাওয়া গেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই চূড়ান্ত চার্জশিট দিয়ে দেয়া যাবে বলে আশা করছি।'

নূরুল ইসলাম অপহরণ ও হত্যা মামলার একজন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গেছে। ১৭ নং শাকচর ইউপির মজু চৌধুরী হাটের মাছ ব্যবসায়ী বাবুল প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে। সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রলীগ নেতা সৈয়দ নূরুল আজিম বাবর এই মামলার রাজসাক্ষী হয়েছেন। তিনিও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছেন অপহরণ ও হত্যাকান্ডের পুরো কাহিনী। তিনি বলেছেন, 'লক্ষ্মীপুরের সাবেক পিপি জেলা বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক ১৭ মার্চ অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলামকে মজুপুরস্থ বাড়ি থেকে ঢাকা মেট্রো খ-১২-৯৭০৫ মাইক্রোবাসযোগে জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবু তাহেরের বাসায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে বস্তাবন্দি করে শহরের অদূরে মজু চৌধুরীর হাটের কাছে মেঘনা নদীতে ফেলে দেয়া হয়।' তদন্তকারী কর্মকর্তা কামরুল হাসান মামলার স্বার্থে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এ মুহূর্তে প্রকাশ করতে চাননি।

লক্ষ্মীপুর আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট তারেক উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে নূরুল ইসলাম হত্যা মামলা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লক্ষ্মীপুরে তার বাসভবনে কথা হলো।

নূরুল ইসলাম হত্যা মামলার এখনকার অবস্থা কী?

'সিআইডি বিগত সরকারের সময়ে এই মামলার তদন্তে ব্যর্থ হয়েছিল। আসামিদের রিমান্ডে এনে যেভাবে জামাই আদরে রাখা হয়েছে তাতে আমরা খুবই হতাশ হয়েছি। মামলার প্রধান আসামি আবু তাহেরকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পুলিশের অর্ডার শিটে লেখা দেখলাম, 'তাহেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার প্রেসার বেড়ে গেছে। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক উনাকে বিশ্রামে দেয়া হয়েছে।' রিমান্ডের তিন দিনই তাকে বিশ্রামে রেখে পরের দিন

জেলে পাঠানো হয়েছে। তাহের এখন কুমিল্লা জেলে। দেখা যাচ্ছে এই মামলার দু'তিনজন আসামি একই সেলে থাকছে। যা জেল কোডের বিধানে নেই। এক কেসের একাধিক আসামিকে একত্রে রাখা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। বিষয়টি আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়েছি। তারা তদন্ত করে এর সত্যতা পেয়েছে। তারা আসামিদের আলাদা রাখার আদেশ দিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের জানা মতে এখনো সে আদেশ পুরোপুরি কার্যকর হয়নি।'

এখন লক্ষ্মীপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা কেমন?

'আমি মনে করি পরিস্থিতি আগের চেয়ে কিছুটা ভালো হয়েছে। তবে সন্ত্রাসী তো দু'দলেই আছে। বিএনপি'র সন্ত্রাসীদের ওপর তাদের এমপিদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাহেরের সন্ত্রাসীরা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তাহেরের একটা অস্ত্রও উদ্ধার হয়নি। সরকার পরিবর্তনের পর তাহের বাহিনী পালিয়েছে। কিন্তু অস্ত্র তো রয়ে গেছে।'

জেলা প্রশাসক বলছেন, ১ মার্চ থেকে ফেনীতে আর কোনো সন্ত্রাস থাকবে না। ফেনীকে শান্তির জনপদ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হবে।

'আমি মনে করি না এই সময় থেকে লক্ষ্মীপুর শান্তির জনপদে পরিণত হবে। এমন ঘোষণা দিলে সেটা হবে লোক দেখানো। জেলা প্রশাসক উপরওয়ালাদের খুশি করার জন্যে এমনটা করতে পারে। আমি খুব আশাবাদী না যে অচিরেই লক্ষ্মীপুর শান্তির জনপদে পরিণত হবে। তবে এটা ঠিক যে আমাদের দুই এমপি এ্যানি এবং আবুল খায়ের ভূঁঞা এখনো পর্যন্ত আন্তরিকভাবে চাইছেন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।'

হাজারীবিহীন ফেনী

লক্ষ্মীপুর বা নারায়ণগঞ্জের তুলনায় ফেনীর চিত্র এখন বেশ অন্য রকম। ফেনীতে এখনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছে, চলছে চাঁদাবাজি। তবে এগুলো মানুষের আলোচনার প্রধান বিষয় নয়। এখনো মানুষ আলোচনা করে হাজারীকে নিয়ে। হাজারী পালিয়ে গেছে এটা ভেবে মানুষ এখনো বিস্মিত হয়।

ফেনীর বর্তমান অবস্থা বুঝতে হলে আগে জানতে হবে জয়নাল হাজারীর পলায়ন, তার ক্যাডার বাহিনী, বিশাল অস্ত্র ভান্ডার, অবৈধভাবে উপার্জিত বিপুল অর্থ ভান্ডার, তার বর্তমান অবস্থান এবং তার অনুপস্থিতিতে ক্ষমতাসীন দলের অবস্থা ও প্রশাসনের কর্মকাণ্ডের ওপর নজর দিতে হবে।

পাঁচ হাজার সদস্যের ক্যাডার বাহিনী গড়ে তুলে যে ব্যক্তিটি দৌর্দন্ড প্রতাপে ফেনী জেলাকে শাসন করতেন, যার নৃশংসতা এরশাদ শিকদারকেও হার মানিয়েছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যে কঠোর ভাষায় হুমকি দিয়েছিল, যার প্রতি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্ধ সমর্থন ও আশীর্বাদ ছিল– সেই স্বঘোষিত সম্রাট রাতের আঁধারে পালিয়ে গেছে এ কথা প্রথম প্রথম মানুষ বিশ্বাসই করতে চায়নি। তখন হাজারীর সমর্থনে তোফায়েল, নাসিমসহ আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা ফেনীতে গিয়ে বলে এসেছিল, হাজারী পুত পবিত্র, তিনি পালাননি সাময়িক আত্মগোপন করে আছেন। যে যাই বলুক, সত্যি কথা হচ্ছে সে পালিয়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে সে পালিয়েছে তা অনেকেরই অজানা। ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট রাতে ছদ্মবেশ ধারণ করে হাজারী তার বাসভবন থেকে পালিয়ে যায়। ১৭ আগস্ট রাতে দাড়ি গোঁফ কেটে ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে তিনি মোহাম্মদ আলী বাজারের পূর্বদিকে টিবি হাসপাতালের পাশ দিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের একিনপুরে গিয়ে আশ্রয় নেন। অনেকগুলো দৈনিক পত্রিকায় লেখা হলেও তিনি পালিয়ে যাওয়ার পর আর কখনো ফেনী বা ঢাকা আসেননি। হাজারীকে সীমান্ত পার করে দিয়েছিলেন এমন একজন ইউপি চেয়ারম্যান এ তথ্য জানিয়েছেন। বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট রাত সাড়ে ৯টার দিকে হাজারী খবর পেয়ে যান যে, ঐ রাতেই তার বাড়িতে বিডিআর ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে কর্মরত সেনাবাহিনীর এক মেজর খবরটি তার স্ত্রীকে জানান। এই মেজর হচ্ছেন আওয়ামী লীগ আমলে বরিশালের গডফাদার খ্যাত এক নেতার ভাগ্নি জামাই। খবরটি সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেজরের স্ত্রী জানান ওই আওয়ামী লীগ নেতাকে। তার থেকে খবর পৌঁছে যায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একজন প্রটোকল অফিসারের কাছে, যার বাড়ি ফেনী। প্রটোকল অফিসার খবরটি সরাসরি মোবাইল ফোনে জানিয়ে দেন জয়নাল হাজারীকে। অতঃপর হাজারী পালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

'আমি খুব আশাবাদী না যে অচিরেই লক্ষ্মীপুর শান্তির জনপদে পরিণত হবে'

অ্যাডভোকেট তারেক উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
সভাপতি, আইনজীবী সমিতি, লক্ষ্মীপুর

হাজারীর পলায়নের সঙ্গী ছিলেন এমন এক ক্যাডার বলেন, তল্লাশি হতে পারে এ আশঙ্কায় হাজারী আগেই তার অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলেছিলেন। ঐ রাত সাড়ে ৯টায় অভিযানের আগাম খবর পাওয়ার পর পালিয়ে যাওয়ার পর মুহূর্তে তিনি তার বাসায় রাখা অস্ত্রগুলো সরিয়ে ফেলতে বলেছিলেন তিনজনকে। এই তিনজন মাঝ রাতের পর হাজারীর বাড়িতে ঢুকতেই পারেনি, কারণ মোবাইল ও টেলিফোন লাইন কাটা ছিল তখন। হাজারী ১০টার পর খেতে বসেন, সামান্য একটু মুখে দিয়েই আবার উঠে পড়েন। রাত ১১টার ইটিভির সংবাদ শুরু হলে তিনি সাদা সার্ট ও সাদা ফুল প্যান্ট পরে বাইরে বের হয়ে আসেন। ঠিক একই রঙের পোশাক ও হেলমেট পরে হাজারীর কর্মচারী মানিক তখন বাড়ির লনে পায়চারী করছিল। তখন বাইরে সব বাতি নিভিয়ে মাত্র একটি বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। এ আলো-আঁধারীতে মানিকের পায়চারী দেখে যে কারো মনে হয়েছে হাজারীই প্রতিদিনকার মতো পায়চারী করছে। এ ফাঁকে হাজারী সবার অলক্ষ্যে একা বেরিয়ে হেঁটে চলে আসেন ফেনী কলেজ অডিটরিয়ামের সামনে। তখন তার কাঁধে ছিলা ডলার ভর্তি ট্রাভেল ব্যাগ এবং দু'টি পিস্তল। এ সময় হাজারীর লাল পাজেরো, মাইক্রোবাস, কার এবং ক্লাস কমিটির ক্যাপ্টেন ইউপি চেয়ারম্যান এ কারামের মাইক্রোবাসটি মাস্টার পাড়ার হাজারীর বাসার সামনে থেকে খুব দ্রুতগতিতে বের হয়ে চারটি চারদিকে চলে যায়। গাড়িগুলো এমনভাবে বের হয় যেন পুলিশ বা বিডিআরের সোর্সের চোখ ওই গাড়ির দিকেই থাকে। এ সময়ে হাজারী ফেনী কলেজ অডিটরিয়ামের সামনে থেকে পায়ে হেঁটে শিশির মজুমদারের বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে সহদেবপুর রেললাইন ক্রস করে অপেক্ষা করতে থাকেন একা। রাত ১২টার দিকে ওই গাড়ি চারটি ফিরে আসে হাজারীর বাসায়। হাজারীর ক্যাডার ও কর্মচারী মানিক ও ভাগ্নে মিল্কি এ সময় রেললাইনের ওপাশে এসে তার সঙ্গে দেখা করে। জানা যায়, এরপর তারা তিনজন হেঁটে আলোকদিয়া হয়ে সোনাপুর গিয়ে এক হাই স্কুলের হেড মাস্টারের বাড়িতে যান। রাত ২টার পর এই হেড মাস্টার হাজারী ও তার দু' সঙ্গীকে নিয়ে এক হিন্দু বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সে রাত ও পরদিন অর্থাৎ ১৭ আগস্ট পুরো দিন হাজারী এই হিন্দু বাড়িতেই ছিলেন। এ সময় তিনি দাড়ি ও গোঁফ কেটে ফেলেন এবং সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে কপালে তিলক লাগান। ১৭ আগস্ট বিকালে ঐ হেড মাস্টারের কাছে জানতে চান পুলিশ-বিডিআর তার বাসা থেকে কি কি উদ্ধার করেছে আর সাংবাদিকরা সেখানে গিয়েছিল কিনা। হাজারীকে সীমান্ত পার করিয়ে দেয়া ওই ইউপি চেয়ারম্যান জানান, ১৭ আগস্ট রাত ৮টায় হাজারীকে ধুতি, পাঞ্জাবি, তিলক পরা অবস্থায় দেখে

প্রথমে তার চিনতে কষ্ট হয়েছে। তবে এ সময়ে তিনি ছিলেন ক্লান্ত, রাতে ঘুম না হওয়া এক বিধ্বস্ত মানুষ। উল্লেখ্য, পুলিশ ও বিডিআরের কর্ডনের বাইরে ছিল এ সোনাপুর গ্রাম। ১৭ আগস্ট রাত আটটার পর ওই ইউপি চেয়ারম্যান তার মোটরসাইকেলে হাজারীকে নিয়ে আসেন লস্করহাটে। লস্করহাটে মানিক, একরাম, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদক আজহারুল হক আরজু ও শাহজাহান সাজু, হারুন চেয়ারম্যান, মিল্কি একটি মাইক্রোবাসে অপেক্ষা করছিল। হাজারী মাইক্রোবাসে চড়ে তাদের সঙ্গে আসেন বলিয়া ইউপির ফকিরহাটে। ফকিরহাটে তার এক আত্মীয়ের (সম্পর্কে বোন) বাড়িতে কিছুক্ষণ অবস্থান করে এরপর ধুমসাদ্দা, নুনেরগোলা হয়ে মোহাম্মদ আলী বাজারে আসেন। বাজারের এক কি.মি. পূর্বদিকে টিবি হাসপাতালের সামনে সবাই অবস্থান নেয়।

আগামী ১ বৈশাখ ফেনীকে আমরা 'শান্তির জনপদ' ঘোষণা করব

এ এস এম সোলায়মান চৌধুরী

ডিসি, ফেনী

আমরা যখন মাইক্রোবাসে এসে টিবি হাসপাতালের সামনে দাঁড়াই তখন অনেক লোক জড়ো হয়ে যায়। সীমান্ত পিলারের দু'শ' গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। ওপারে বিএসএফ-এর প্রহরা চলছে। এ পাশে বিডিআর টহলরত। ওপারে গাছপালায় ঢাকা চৌধুরী সাহেবের মাজার। অন্য সময় বাংলাদেশের মানুষ খুব সহজে মাজারে যেতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ সীমান্ত পার হয়ে মাজারে যায়। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতির পর সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। বিডিআর-বিএসএফ এখন আর মানুষকে মাজারে যেতে দিচ্ছেন না। সীমান্ত এলাকার অনেকেই টিপু সুলতানকে চিনলেন। তিনি এখন কেমন আছেন খোঁজ-খবর নিলেন। বললেন হাজারীর এই পথে পালিয়ে যাওয়ার কাহিনী।

টিবি হাসপাতালটি সীমান্তের ৫ গজের মধ্যে অবস্থিত। একটু পরে এখানে মোটরসাইকেল নিয়ে হাজির হন ওই ইউপি চেয়ারম্যান। এ সময় হাজারী আরজু, সাজু ও একরামকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছিলেন। বাসায় কিছু অস্ত্র থেকে যাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে গালি দিচ্ছিলেন। তখন মানিক ও মিল্কি মাইক্রোবাসে বসে কান্নাকাটি করছিল। মিনিট দশেক এখানে অবস্থান করে দেখে, বিডিআর এর কোনো সদস্য ঐ পয়েন্টে আছে কিনা। সীমান্ত ফাঁকা দেখে প্রথমে হাজারী কাঁধে ডলার ভর্তি বড় স্পোর্টস ব্যাগটি নিয়ে দ্রুত পায়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ওপারে চৌধুরী সাহেবের মাজারে গিয়ে থামে। একটু পরে বাকিরাও সেখানে গিয়ে পৌঁছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে এ সময় লুঙ্গি পরা দু'জন লোক এসে হাজির হয়। তারা কুখ্যাত চোরাচালানি অর্জুন ও জীবন বাবুর লোক। হাজারীর সঙ্গে তাদের একান্তে কথা হয়। তারপর হাজারী সঙ্গীদের নিয়ে লোক দুটো অনুসরণ করে ১ কি.মি. দূরে ত্রিপুরা রাজ্যের বিলোনিয়া মহকুমার একিনপুরে অর্জুনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। এর ক'দিন পর তার ক্লাস কমিটির প্রথম সারির ক্যাডাররাও সীমান্ত অতিক্রম করে একিনপুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

চোরাচালানি অর্জুনের বাড়িতে ১ অক্টোবর নির্বাচন পর্যন্ত হাজারী ছিলেন। অর্জুনের বাড়ি ফেনী সীমান্তের খুব কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে গ্রামীণ ফোনের মোবাইল কাজ করতো। হাজারী তার টিএন্ডটি আউট গোয়িং সুবিধা কাজে লাগিয়ে মোবাইল থেকে নির্বাচনের পূর্ব দিন পর্যন্ত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা অফিসে ফোন করে নানা গুজবের জন্ম দিত এবং পত্রিকা অফিসগুলোও বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, হাজারী বুঝি ঢাকায় আত্মগোপন করে আছে। কয়েকটি পত্রিকা তখন হাজারীর টেলিফোন সংলাপকে নিউজ হিসেবে প্রকাশও করেছিল। চ্যানেল আই তখন হাজারীর একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিল। বলেছিল এটি ঐ চ্যানেলের নিজস্ব অনুষ্ঠান এবং তা হাজারীর আত্মগোপন অবস্থায় ফেনীর কোনো এক স্থান থেকে ধারণ করা হয়েছিল। পরে জানা যায়, ভারতের একিনপুরে হাজারী তার নিজস্ব লোক দিয়ে ঐ সাক্ষাৎকারটি রেকর্ড করে এক কপি চ্যানেল আই-এর কাছে আরেক কপি একুশে টিভির কাছে পাঠায়। একুশে টিভি তা প্রচার করেনি। কিন্তু চ্যানেল আই সেটা প্রচার করে বিতর্কিত হয়েছিল। পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত হাজারী একিনপুরেই ছিলেন। একিনপুর সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে এবং প্রায়ই এপার-ওপার যাতায়াত করে এমন অনেক বাংলাদেশী নাগরিক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, একিনপুরে থাকাকালে হাজারীকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সদস্যরা পাহারা দিত। বিনিময়ে হাজারী প্রতিদিন ৬০ হাজার টাকা করে বিএসএফকে দিতেন। নির্বাচনের আগে-পরে হাজারীর ক্যাডাররা প্রায়ই রাতে ওপার থেকে এপারে আসত এবং গোপনে তৎপরতা চালাতো। কিন্তু হাজারী পালিয়ে যাওয়ার পর আর একবারও বাংলাদেশের ভূখণ্ডে পা রাখেনি। জানা যায়, কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনেও হাজারীর ক্যাডাররা ৪টি ভোট কেন্দ্র দখল করেছিল এবং নির্বাচনের দিন সোনাপুর গ্রামে সেনাবাহিনীর টহল দলের ওপর হামলা চালিয়েছিল।

নির্বাচনে পরাজিত হলেও হাজারী প্রায় ৬৭ হাজার ভোট পেয়েছিলেন। জনপ্রিয়তা না থাকলে একটা লোক এতো ভোট কিভাবে পেয়েছেন এ প্রশ্নের জবাবে ফেনী জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত স্টাফ ইফতেখারুল ইসলাম ২০০০কে বলেন, 'জনগণ হাজারীকে ভোট দেননি, ভোট দিয়েছেন দলের নেত্রী ও নৌকা মার্কাকে। কারণ দলের সভানেত্রী নির্বাচনের পূর্বে ফেনী গিয়ে বলেছিলেন, ফেনীর দায়িত্ব আমি নিলাম, আমি ৪টা আসনে প্রার্থী হয়েছিলাম ফেনীসহ এখন ৫টি, হাজারীর দায়িত্ব আমি নিলাম, আপনারা আমাকে ভোট দিন।'

আওয়ামী লীগ নেতা ইফতেখারের মতে, 'শেখ হাসিনার এ আবেদনের পর ফেনীতে আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাসীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এমনকি হাজারীর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ যেসব সিনিয়র আওয়ামী লীগে নেতাকে হাজারী নিজ হাতে চড়-থাপ্পড় মেরে অপমান অপদস্ত করেছিলেন তারাও নেত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজারীর ভোটের জন্য পরিশ্রম করেছেন। ফলে ফেনীতে নৌকা মার্কার পক্ষে ৬৭ হাজার ভোট পড়েছে।'

নির্বাচনের পরদিনই হাজারী একিনপুর ত্যাগ করে চলে যান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিলোনিয়া মহকুমার সাবরুম নামক স্থানে। দু' সাপ্তাহ পর সেখান থেকে গিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী মনু নামক গ্রামে গিয়ে ওঠেন। সেখানে তিনি অডিটরিয়ামের মতো করে একটি আধাপাকা বড় ঘর তৈরি করে ঘনিষ্ঠ ক্যাডারদের নিয়ে থাকতেন। এসব ঘনিষ্ঠ ক্যাডারদের কিছু এখন দেশে ফিরে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন জানায়, হাজারীকে সেখানে সব ধরনের আশ্রয় ও সহযোগিতা করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। মানিক সরকারের সঙ্গে হাজারীর আগে থেকে যোগাযোগ ছিল। ১৯৯৭ সালে হাজারীর ফেনী বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারত গিয়েছিলেন। তখন শোনা গিয়েছিল যে, হাজারী বস্তা ভর্তি টাকা নিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে ব্যাংকে জমা রেখেছিলেন। ত্রিপুরার সাবরুম ও মনুতে হাজারী এন্টিনা লাগিয়ে গ্রামীণ ও একটেল-এর দুটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন এবং ক্যাডারদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক

যোগাযোগ রাখতেন। হাজারীর এই মোবাইল নম্বর দু'টিতে আমরা অনেকবার যোগাযোগ করেছি। প্রায় দু'মাস আগে একবার হাজারীর সঙ্গে কথা হয়। তিনি আগরতলা যাচ্ছেন সেখান থেকে ফিরে এসে টেলিফোনে সাক্ষাৎকার দেবেন বলে জানান। এরপর ফোন করলে দেবু এবং কামাল নামে দু'জন ফোন ধরে বলেন, ভাইছা আগরতলা গেছে এখন পাওয়া যাবে না। দু'দিন পর ফোন করতে বলেন। দু'দিন পর ফোন করলে দেবু বলেন, ভাইছা বলেছেন, এখন তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন না। তবে তিনি আগামী ২০ দিনের মধ্যে দেশে ফিরবেন। ২০ দিন অবশ্য পার হয়ে গেছে বেশ কয়েকদিন আগেই।

গত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে একদিন হাজারীকে প্রতিদিন দুধ দিত যে হিন্দু ভদ্রলোক সে এসে দুধের দাম চাইলে তার সঙ্গে হাজারীর তর্ক-বিতর্ক বাধে। হাজারীর দাবি ছিল দুধওয়ালা প্রতিদিন একটু একটু দুধ কম দিত তাই তিনি এক লিটার দুধের দাম কম দেবেন। এ নিয়ে বিতর্কের এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে হাজারী বৃদ্ধ দুধওয়ালাকে সজোরে লাথি মারলে ঐ লোক অজ্ঞান হয়ে যায়। এ নিয়ে সেখানে পঞ্চায়েতের বৈঠকে হাজারীকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। জরিমানার টাকা দিয়ে হাজারী একদিনের জন্য সাবরুমে আসেন। এর পরদিন ত্রিপুরা পুলিশ হাজারীর মনু'র বাড়ি থেকে একটি স্পেনিস পয়েন্ট টু টু বোর পিস্তলসহ হাজারীর এক ঘনিষ্ঠ ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে। এ ক্যাডারের নাম হচ্ছে সাহাবউদ্দিন। সে ফেনী জেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের শরণ পাহাড়তলি গ্রামের মৃত নাদু মিয়ার পুত্র। ত্রিপুরার পুলিশের কাছে সাহাবউদ্দিন জানায়, পিস্তলটি জয়নাল হাজারী দিয়েছে তাকে রাখার জন্য। এ খবর পেয়ে হাজারী সাবরুম থেকে মনুতে না এসে চলে যান দিল্লিতে। এদিকে হাজারী ত্রিপুরা ত্যাগের খবর পেয়ে সেখানকার পুলিশ তার মনুর বাড়ি সিল করে দেয়। জানা যায়, গত ৩ জানুয়ারি গভীর রাতে হাজারী গোপনে মনু আসেন এবং সিল করা বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আলমিরা থেকে ডলার ভর্তি স্পোর্টস ব্যাগটি নিয়ে চলে যান কলকাতার দিকে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, জয়নাল হাজারী এখন কলকাতায় ব্রজন বণিক নামক এক স্বর্ণ চোরাচালানির আশ্রয়ে আছেন। এ ব্রজন বণিকের বাড়ি ফেনী ছিল। সে ফেনীর মাস্টার পাড়ার সাধন বণিকের ভাই। ১৯৯৯ সালে ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বর্ণের এক চোরাচালান ধরা পড়লে এর সঙ্গে ফেনীর স্বর্ণ ব্যবসায়ী উক্ত ব্রজন বণিকের সম্পৃক্ততার কথা ছড়িয়ে পড়ে। তখন পুলিশ ব্রজনকে গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা চালালে সে ভারতে পালিয়ে যায়। সে আগে থেকেই তার অর্থ সম্পদ ভারতে পাচার করেছিল। বর্তমানে কলকাতা দমদম বিমানবন্দরের পাশেই এক মার্কেটে ব্রজন বণিকের বড় একটি স্বর্ণের দোকান রয়েছে। ব্রজনের মাফিয়া কানেকশনও ভালো বলে জানা গেছে। জয়নাল হাজারীর সঙ্গে চোরাচালান ব্যবসাজনিত কারণে ব্রজন বণিকের সুসম্পর্ক ছিল। তাই ব্রজনের শেল্টারে থেকে হাজারী ইংল্যান্ড পাড়ি দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর আগে গত নবেম্বর মাসে হাজারী দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে হিন্দু নামে ত্রিপুরার একটি ঠিকানা ব্যবহার করে ভারতীয় পাসপোর্ট বের করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এখন তিনি ব্রজন বণিকের সহযোগিতায় লন্ডন যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কারণ লন্ডনের ব্যাংকেই হাজারীর অধিকাংশ টাকা গচ্ছিত রয়েছে।

হাজারী ঠিক কত টাকার মালিক সে সম্পর্কে কারো ধারণাই পরিষ্কার নয়। হাজারী নামে-বেনামে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে টাকা রাখত। একটি হিসাব থেকে হাজারীর টাকার পরিমাণ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ফেনী শাখায় হাজারী ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি একটি অ্যাকাউন্ট খোলে। তার অ্যাকাউন্ট নং-০৩।

ভিপি জয়নাল এমপি

সাঈদ ইসকান্দার এমপি

জানুয়ারির ১ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত তার এই অ্যাকাউন্টে জমার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। এখন পর্যন্ত এরকম ছয়-সাতটি অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। হাজারী কয়েকশ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে বলে জানা যায়। ফেনীর ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ম্যানেজার মোঃ নাসিম হাজারীর টাকা সংরক্ষণ ও পাচারের কাজে সহযোগিতা করতো বলে জানা যায়।

কেমন আছে ফেনী

দীর্ঘদিন যাবৎ জেলা শহর ফেনী ছিল সংবাদ পত্রের শিরোনামে। সন্ত্রাসের কারণে বহুল আলোচিত এ ফেনী নামটি উচ্চারিত হলেই মানুষের মনে এক ভয়াল জনপদের ছবি ভেসে উঠতো। আর সন্ত্রাস এবং ফেনী এ দুটি শব্দের পাশাপাশি যে নাম প্রথমেই উচ্চারিত হতো তা হলো জয়নাল হাজারী। গত ৫ বছরে তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি সন্ত্রাসের জাতীয় প্রতীক হয়ে উঠেছেন। মাত্র চার মাস আগেও ফেনীর মানুষ ফেনীতে বসে সন্ত্রাস বা হাজারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস করতো না। এসব কথা হতো ফিস্‌ফিসিয়ে, গোপনে, যাতে কেউ শুনতে না পায়। সেই ফেনীতে এখন মানুষ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। প্রকাশ্যে আলোচনা হচ্ছে হাজারী বাহিনীর নৃশংসতার কাহিনী। হাজারীবিহীন ফেনী এখন কেমন আছে তা দেখার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে ফেনী গিয়ে জানা যায়, সন্ত্রাসের জনপদ খ্যাত ফেনীকে জেলা প্রশাসক আগামী ১ বৈশাখ থেকে শান্তির জনপদ ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন, তবে ফেনীর মানুষের মন থেকে এখনো হাজারী আতঙ্ক পুরোপুরি কাটেনি। কারণ বিগত ৫ বছর হাজারী ও তার বাহিনীর লোকজন সরকারি-বেসরকারি জায়গা, দোকান, স্কুল-কলেজ, মসজিদ, মন্দির থেকে শুরু করে পাবলিক টয়লেট পর্যন্ত দখল করেছিলো। ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী প্রবাসী থেকে শুরু করে রাস্তার হকার ও মুচিকে পর্যন্ত চাঁদা দিতে হতো। কোনো এলাকায় তো আইনই ছিল ছেলে-মেয়ের বিয়েশাদি, খৎনা কিংবা কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান করতে হলেও চাঁদা দিতে হতো। ১৯৯৯ সালে এক জনসভায় কৃষক দলের সাবেক সভাপতি (বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা) মাহবুবুল আলম তারা বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগ আমলে ফেনীবাসীর এমন অবস্থা হয়েছে যে, একমাত্র জন্ম ও মৃত্যু ছাড়া সব কাজেই চাঁদা দিতে হয়।'

গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর বদলে গেছে সেই ফেনী। নির্বাচনে জনগণ নীরব ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে শুধু হাজারীকেই নয়, তার দল আওয়ামী লীগকেই ক্ষমতাছাড়া করেছে।

একজন স্থানীয় সাংবাদিক বললেন, 'ফেনীবাসী বড় ডাকাত তাড়িয়ে ছোট ডাকাতকে নির্বাচিত করেছে। ফেনীর সন্ত্রাসের বুঝি শেষ হবে না। কয়েকটি পত্রিকায় ভিপি জয়নালকে পাঠকের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করেছিল, মনে হয়েছিল জয়নাল হাজারীর চেয়ে ভিপি জয়নালও নৃসংসতার ক্ষেত্রে কোনো অংশে কম নন। এ ব্যাপারে ফেনী স্থানীয় সাংবাদিকদের বক্তব্য হচ্ছে, তখন পত্রিকাগুলো হাজারী বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে ব্যালেন্স করার জন্য ভিপি জয়নালের বিষয়টি লিখত। দীর্ঘদিন জাসদ রাজনীতি করা ভিপি জয়নাল ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর বিএনপিতে যোগ দেন। তারপর গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাভোগের পর ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জামিনে বের হন। নির্বাচনে জয়লাভের পর অনেকে ভেবেছিল, ভিপি জয়নাল বা বিএনপি'র লোকজন প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠবে, তার লোকজনও হাজারীর ক্লাস কমিটির অনুসরণে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হবে। কিন্তু সরেজমিনে ফেনীতে গিয়ে দেখা গেছে এখনো পর্যন্ত ভিপি জয়নাল তার

লোকদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষণা করে তিনি প্রশাসনকে বলে দিয়েছেন নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য। এর প্রমাণও পাওয়া গেছে। বিএনপি'র গত চার মাসের শাসনে ফেনীতে সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদল নেতা-কর্মী ক্যাডার। এখনও প্রায় ৬০ জন বিএনপি'র নেতা-কর্মী জেলে আছে। সোনাগাজী ও ছাগলনাইয়া থানায় এখনও কিছু ছিনতাই, চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটছে বলে খবর পাওয়া গেলেও সার্বিকভাবে ফেনী এখন অনেক জেলার তুলনায় ভালো আছে বলে বিভিন্ন পেশার লোকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে। হাজারীর সময়ে যেখানে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে টেন্ডারে হাজারীর লোকরা ছাড়া কেউ টেন্ডার জমা দিতে পারতো না এবং হাজারীকে ১৫% থেকে ২৫% কমিশন চাঁদা না দিয়ে কাজ হতো না, সেখানে এখন প্রকাশ্যে টেন্ডার হচ্ছে, ঠিকাদাররা কাজ করছে, কেউ তাদের কাছে চাঁদা দাবি করছে না। তবে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরপর কিছু লোক বিএনপি'র ব্যানারে বাস, ট্রাক, টেম্পো স্ট্যান্ডগুলো নীরবে দখল করে নেয়। এ প্রসঙ্গগুলো নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে কথা হয় ফেনী-২ এর-এমপি জয়নাল আবেদীন ওরফে ভিপি জয়নালের সঙ্গে।

বাস, টেম্পো স্ট্যান্ড দখল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তার কোনো লোক এসব দখল করেনি, বরং বিগত সময়ে যেসব দলীয় ক্যাডার এগুলো দখল করেছিল ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর তারা পালিয়ে গেলে প্রকৃত মালিক ও শ্রমিকরা তাদের সংগঠন পুনর্গঠিত করেছে। এ ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা বা আগ্রহ নেই। আমি বাসস্ট্যান্ড টেম্পো স্ট্যান্ড-এর চাঁদার টাকা খাই না, আমি প্রকাশ্যে বলে দিয়েছি এ হারাম আমি খাব না।'

বর্তমান প্রশাসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা প্রশাসনের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি বা তদবিরের কাজ করছি না, প্রশাসন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করছে, যার প্রমাণ বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমাদের দলীয় লোকজনই বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে।'

ফেনীর মানুষ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় জেলা প্রশাসক সোলেমান চৌধুরীকে ডাকেন রবিনহুড বলে। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন যেমন নিরপেক্ষ ভূমিকার জন্য সারা দেশের মানুষের কাছে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে আছেন, তেমনি সন্ত্রাস দমনের জন্য ডিসি সোলেমান চৌধুরীও ফেনীর মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। এখন কোনো গ্রাম-গঞ্জে যদি কোনো ছোটখাটো ঘটনাও ঘটে, চুরি, ডাকাতি হয় মানুষ সংশ্লিষ্ট থানায় না গিয়ে প্রথমেই ছুটে যায় ডিসি'র কাছে। কারণ মানুষের বিশ্বাস জন্মে গেছে এ মানুষটির কাছে গেলে অন্তত

ছবিটি ফেনীর বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত থেকে তোলা। এই গাছগুলো ভারতের অংশে। এর পেছনেই চৌধুরী সাহেবের মাজার। হাজারী এই পথেই ভারতে পালিয়ে যায়।

সুবিচার পাওয়া যাবে। ডিসি সোলেমান চৌধুরী বলেছেন, তিনি আগামী ১ বৈশাখ ফেনীকে শান্তির জনপদ ঘোষণা করবেন। এর মধ্যে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, ফেনী আদৌ শান্তির জনপদ হবে কি? যেখানে জয়নাল হাজারীর বিশাল অস্ত্র ভান্ডারে প্রশাসন হাতও দিতে পারেনি এবং পৌর চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন হাজারীর নেতৃত্বে হাজারীর ক্লাস কমিটির সদস্যরা মাস্টারপাড়া, সহদেবপুর এলাকায় পুনঃসংগঠিত হচ্ছে– এ অবস্থায় আদৌ কি ফেনী সন্ত্রাসমুক্ত হবে? এ প্রশ্ন ফেনীর সচেতন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। অভিযোগ রয়েছে জয়নাল হাজারীর চাচাতো ভাই জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও পৌর চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন হাজারী হত্যাসহ অনেকগুলো মামলার আসামি হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যে আছেন, পৌরসভার অফিস করছেন এবং গোপনে ক্লাস কমিটিকে পুনর্গঠিত করার কাজ করে চলছেন। কিন্তু পুলিশ তাকে ধরছে না। ইতিমধ্যে ক্লাস কমিটির দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন আবজু ও শাজুর নেতৃত্বে বেশকিছু ক্লাস কমিটির ক্যাডার সংগঠিত হয়েছে। এরা দিনের বেলায় সহদেবপুর, মাস্টারপাড়া, রেলস্টেশন এলাকায় ঘোরাফেরা করে আর রাতে সহদেবপুর, আলোদিয়া, ভালুকিয়া গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ঘুমায় বলে জানা গেছে। কিন্তু পুলিশ বলছে, তারা এদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ফেনীর শান্তি কত দূর? এ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। ফেনীর সচেতন মানুষ মনে করে গত চার মাস ভিপি জয়নাল যেমন ছিলেন আগামী দিনগুলোতেও যদি এমনই থাকেন এবং বর্তমান জেলা প্রশাসক সোলেমান চৌধুরী আরো কয়েক বছর ফেনীতে থাকেন তাহলে ফেনী যে সন্ত্রাসের জনপদ ছিল এটা একদিন মানুষ ভুলে যাবে।

ফেনীর বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে ফেনী ডিসি অফিসে কথা হয় জেলা প্রশাসক এএসএম সোলায়মান চৌধুরীর সঙ্গে।

ফেনীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন কেমন?

ফেনীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। আগামী ১ বৈশাখ ফেনীকে আমরা 'শান্তির জনপদ' ঘোষণা করব। সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।'

ফেনীতে এই মুহূর্তে হয়ত বড় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে না। কিন্তু হাজারীর সন্ত্রাসী বাহিনীর অস্ত্রও উদ্ধার হয়নি, সন্ত্রাসীও গ্রেপ্তার হয়নি। তাহলে সন্ত্রাস নির্মূল হবে কীভাবে?

'আপনার এই প্রশ্নের সঙ্গে আমি মোটেই দ্বিমত পোষণ করব না। সন্ত্রাসীও আছে, অস্ত্রও আছে। অস্ত্রও খুব কমই উদ্ধার হয়েছে, সন্ত্রাসীও খুব কমই ধরা পড়েছে। তবে অস্ত্র তারা ব্যবহার করতে পারছে না। এখানে আমরা কিছুটা সফল হয়েছি। তবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধে এখনো আমরা পুরোপুরি সফল হইনি। আমাদের কাছে খবর আসে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হুমকি, চাঁদাবাজির খবর আমরা পাচ্ছি। এসবের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্যবস্থা নেই।'

যারা চাঁদা দাবি করছে তাদের কী সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক পরিচয় আছে?

'না, এদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। দলীয় পরিচিতি দিয়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি করাটা বন্ধ হয়ে গেছে। জনপ্রতিনিধিরা আমাদের সমর্থন করছেন। কোনো সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করলে তার পরিচিতি বিএনপি হলেও এঁরা কোনো হস্তক্ষেপ করছেন না। অনেক সময় তারা নিজেরাও সন্ত্রাসীদের নাম-ঠিকানা দিয়ে গ্রেপ্তার করতে সহযোগিতা করছেন।'

হাজারীর ক্লাস কমিটির সন্ত্রাসীরা পুনরায় এলাকায় ফিরছেন বলে জানা গেছে।

'এরকম খবর আমি যেটা জেনেছি সেটা হলো তারা কেউ কেউ হয়ত এলাকায় এসেছেন, পুনর্বাসিত হওয়ার চেষ্টা করছেন।' এখন আবার সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পুনর্বাসনের নজীর কিন্তু আমরা পাইনি।'

ছবিসহ ক্লাস কমিটির তালিকা তো আপনাদের কাছে আছে। ক্লাস কমিটির প্রধান কাজই তো ছিল সন্ত্রাস করা।

'জি।'

ক্লাস কমিটির এখন যারা ফিরে এসে সন্ত্রাস করছে না, আপনারা কী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

'আমরা কিন্তু তালিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছি। যারা ফিরে এসেছে কোনো ছাড় দিচ্ছি না। যেহেতু তারা আগে অপরাধ করেছে সেই অপরাধের বিচার তো হতেই হবে।'

পৌরসভা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন হাজারী জয়নাল হাজারীর খুবই কাছের মানুষ। জয়নাল হাজারীর হয়ে অনেক অপকর্ম করেছেন তিনি। তার নামে হত্যা মামলাও আছে। তিনি তো এখন প্রকাশ্যেই অবস্থান করছেন।

'আপনি এ প্রশ্ন যদি করেন তাহলে এই প্রশ্নের সঙ্গে আরো প্রশ্ন চলে আসে। যেমন আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য যারা আছেন তাদের কারো কারো নামেও এমন মামলা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশ মামলার তদন্ত করছে। তদন্তে যদি প্রাথমিক অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। তিনি যেই হোন না কেন।'

মোশাররফ হোসেন হাজারী পৌরসভা চেয়ারম্যান হত্যা মামলার আসামি। তিনি যদি প্রশাসনের সঙ্গে ওঠা-বসা করেন তাহলে বিষয়টি কেমন দেখায়?

'সেটি হচ্ছে না কিন্তু। আমাদের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই।'

মোশাররফ হাজারীর ইফতার পার্টিতে তো আপনি গেছেন।

'এটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সেখানে তিনি একা নন, পৌরসভার আরো অনেক কর্মকর্তা ছিলেন। তাদের সবাই অপরাধের সঙ্গে জড়িত নন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে আমি সেখানে গিয়েছি।'

ঠিক আছে এটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান। তারপরও তিনি হত্যা মামলার আসামি। জেলা প্রশাসক হিসেবে তার অনুষ্ঠানে যাওয়াটা কী ভালো দেখায়?

'এটা বিবেচনার ভার আমি আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম।'

তবে এ কাদের ছায়া

গত নির্বাচনে মানুষ বিএনপিকে ভোট দিয়েছিল আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের হাত থেকে মুক্তির আশায়। আওয়ামী শাসনের পাঁচ বছরে দেশে প্রতিদিন নিহত হয়েছে নয় জন মানুষ। বিএনপি সরকারের বয়স সবেমাত্র চার-পাঁচ মাস। কিন্তু সরকারের মেয়াদ যত বাড়ছে হত্যাকান্ডের সংখ্যাও বাড়ছে।

ঢাকার খুব কাছের জেলা নারায়ণগঞ্জ। শামীম ওসমান নারায়ণগঞ্জের মানুষকে শান্তিতে ঘুমাতে দেননি পাঁচ বছর। মানুষ ভোট দিয়ে তার জবাব দিয়েছে। লক্ষ্মীপুরের তাহেরের সন্ত্রাস তো কিংবদন্তিতুল্য। ফেনীর হাজারী আরো এক ধাপ এগিয়ে। কিন্তু এই জনপদের সন্ত্রাসের তিন গডফাদার এখন এলাকায় নেই। স্বাভাবিকভাবে দেখলে তিনটি অঞ্চলের অবস্থাই এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো। মানুষ আগে ভয়ে সন্ত্রাস হচ্ছে এ কথা বলার সাহস করতো না, সন্ত্রাসীদের নাম মুখে আনা তো দূরের কথা। এখন সন্ত্রাসীদের নাম ধরে বলছে কারা সন্ত্রাস করছে। পরিস্থিতির উন্নতি বলতে এটুকুই। না, উন্নতি আরো আছে। এই তিন জনপদের কোথাও এখনো পর্যন্ত বড় কোনো সন্ত্রাসীর আবির্ভাব ঘটেনি, যার গায়ে সরকারের সিল আছে। কিন্তু সন্ত্রাসীও আছে, সন্ত্রাসও আছে। লক্ষ্মীপুরে এখনো পর্যন্ত বিএনপি'র একজন তাহের তৈরি হয়নি। কিন্তু সাহাবুদ্দিন সাবু আলোচনায় আছে। তার আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম সবকিছুতেই মানুষ তাহেরের প্রতিচ্ছবি দেখছে। তাহেরকে সরাসরি শেল্টার দিত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সাবুকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেল্টার দিচ্ছেন না। তবে তাকে শেল্টার দেয়ার অভিযোগ আছে প্রতিমন্ত্রী জিয়াউল হক জিয়ার বিরুদ্ধে। এক সময়ের সিবিএ নেতা জিয়া তার প্রভাব বৃদ্ধির জন্য হয়ত ব্যবহার করতে চাইছেন সাবুকে। সাবুও সে পথেই অগ্রসর হচ্ছেন। ইতিমধ্যে গঠন করে ফেলেছেন বাহিনী। জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছেন টাইগার ফারুক, দিপু প্রমুখ কুখ্যাত সন্ত্রাসীকে। এই সন্ত্রাসীরা জেল থেকে বের হয়ে এসে সমাজে কী ভূমিকা রাখবে সেটা সহজেই অনুমেয়। ফলে লক্ষ্মীপুরে তাহের না থাকলেও তাহেরের অনেক ছায়া ভাসছে মানুষের চোখে।

নারায়ণগঞ্জের ক্ষেত্রেও বলা যায় একই কথা। শামীম ওসমানের মাপের বিএনপি'র কোনো সন্ত্রাসী গড়ে ওঠেনি সেখানে। তবে আছেন একজন জাকির খান বা ডেভিড। যাদের চোখে আদর্শ শামীম ওসমান। বিএনপি'র কোনো নেতারই তাদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আওয়ামী লীগের সময় মানুষ দেখতো একজন শামীম ওসমানকে। এখন দেখছে শামীম ওসমানের অনেক ছায়াকে। বিএনপির ছোট-বড় সব সন্ত্রাসী নিজেকে ভাবছে শামীম ওসমান। অসংখ্য শামীম ওসমানের ছায়া এখন নারায়ণগঞ্জে। এই ছায়া কখন বাস্তব হয়ে ওঠে সেই আশঙ্কা মানুষের চোখেমুখে।

এই তিন জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাস ছিল ফেনীতে। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, এই তিন জেলার মধ্যে ফেনীর অবস্থাই এখন তুলনামূলকভাবে ভালো। সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী সবই ফেনীতে আছে, তারপরও অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। এর বড় কারণ হয়তো জেলা প্রশাসক সোলেমান চৌধুরীর সাহসী ভূমিকা। এছাড়া সাংসদ ভিপি জয়নালও সম্ভবত তার আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। তিনি সত্যি সত্যি সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন না বলেই মনে হয়। তবে সাঈদ ইস্কান্দার-ভিপি জয়নাল বিরোধ ফেনীর পরিস্থিতি ঘোলাটে করে দিতে পারে। ভিপি জয়নাল চাইছেন জেলা প্রশাসক ফেনীতে থেকে তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখুক। কিন্তু বিএনপির অন্য অংশটি জেলা প্রশাসকের কার্যক্রম পছন্দ করছেন না। শুরুতে আওয়ামী লীগ বলত জেলা প্রশাসক সোলেমান চৌধুরী বিএনপি-জামায়াতের লোক। এখন স্থানীয় বিএনপির একটি অংশ বলছে তিনি আওয়ামী লীগের লোক। কারণ নির্বাচনের পর থেকে জেলা প্রশাসক পনেরো-বিশ জন বিএনপি সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছেন।

ফেনী বিএনপি'র মধ্যে মানুষ জয়নাল হাজারীর ছায়া আপাতত দেখছেন না। তবে এ অবস্থা কতদিন থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ হাজারীর সন্ত্রাসী এবং অস্ত্র কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি প্রশাসন। অল্প সময়ের মধ্যে ফেনীর জেলা প্রশাসক সম্ভবত বদলি হয়ে যাবেন। সোলেমান চৌধুরী যে সাহসী ভূমিকা নিয়েছেন, পরবর্তী জেলা প্রশাসক যদি এমন সাহস না দেখান তাহলে ফেনীতেও অচিরেই দেখা যাবে জয়নাল হাজারীর ছায়া।

লক্ষ্মীপুর, নারায়ণগঞ্জের এই ভয়ঙ্কর 'ছায়া' কী বর্তমান সরকার দেখতে পাচ্ছে? সরকার কী বুঝতে পারছে ফেনীর রাজনীতি কোন দিকে এগুচ্ছে? শামীম ওসমান, তাহের, হাজারী আওয়ামী সরকারের পতন যত তরান্বিত করেছিল, 'ছায়া'গুলো বাস্তবে রূপ নিলে বর্তমান সরকারের ক্ষেত্রে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। সেটা হতে পারে আরো ভয়ঙ্কর। কারণ শামীম, হাজারী, তাহেরদের সন্ত্রাসী বাহিনী ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। বিএনপি'র এই 'ছায়া'গুলোর ওপরেই নেতাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। 'ছায়া' বাস্তব রূপ নিলে নিয়ন্ত্রণ আরো থাকবে না।

পাদটিকা : *'হাসিনার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' প্রতিবেদন ব্যাপকভাবে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল। বিএনপি বাহ্বা দিয়েছিল। নির্বাচনের আগে ATN বাংলার 'সাবাস বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে ২০০০-এর এই সংখ্যাটি তারা একাধিকবার দেখিয়েছে। আর এই সংখ্যাটি বের হওয়ার পর আওয়ামী লীগ প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিল। প্রতিবেদককে ফোনে জীবননাশের হুমকিও দেয়া হয়েছিল। এখন বিএনপি কী করবে? তারা কি আওয়ামী লীগের পথেই অগ্রসর হবে?*